#আমি পদ্মজা পর্ব ৭২

____
সন্ধ্যা নেমেছে কিছুক্ষণ পূর্বে। আজ আকাশ পরিষ্কার। কুয়াশা নামেনি। সন্ধ্যার নামায আদায় করে পদ্মজা নিজ ঘরে বসে আছে। অপেক্ষা করছে মৃদুলের জন্য। নিস্তব্ধতা ভেঙে পায়ের শব্দ ভেসে আসে। আমির ঘরে প্রবেশ করে। পদ্মজার থেকে দূরত্ব রেখে চেয়ারে বসে। তারপর প্রবেশ করলো মৃদুল। মৃদুলের বুক কাঁপছে। সে চিন্তিত। পদ্মজা মৃদুলকে সালাম দিল। তারপর বললো,'বসুন ছোট ভাই।'
মৃদুল বসলো। সে বুঝতে পারছে না কী হতে চলেছে। শঙ্কিত সে। গোপনে ঢোক গিলে একবার আমিরকে আরেকবার পদ্মজাকে দেখলো। পদ্মজা বললো,'কেমন আছেন?'
মৃদুলের অস্বস্তি হচ্ছে। সে দ্রুত জবাব

দিল,’ভালো আছি ভাবি। কোনো সমস্যা হইছে?’
‘না,কোনো সমস্যা হয়নি। কেমন লাগছে এখানে? খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাক হচ্ছে?’
‘জি ভাবি,সব ঠিক আছে। ভালো লাগছে। রানি আপার কথা খুব মনে পড়ে।’
পদ্মজা আক্ষেপের স্বরে বললো,’রানি আপা কেন যে এমন করলো! যদি ফিরে আসতো।’
মৃদুল নিরুত্তর। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকালো। আমির নিশ্চুপ। সে এই আলোচনায় যাবে না। পদ্মজা মৃদুলকে বললো,’আচ্ছা সোজাসুজিভাবেই কথা বলি। পূর্ণার সাথে আপনার সম্পর্কটা কী?’
পদ্মজার প্রশ্ন শুনে মৃদুলের দম গলায় এসে আটকে যায়। সামনে বড় ভাই আমির হাওলাদার। যাকে সে ভয় পায়। প্রশ্ন করছে,পূর্ণার বড় বোন। যে বোনকে পূর্ণা

সবচেয়ে বেশি ভয় পায় আর ভালোবাসে। এমন পরিস্থিতিতে যারা পড়েছে তারাই বুঝবে তখন কেমন অনুভূতি হয়। মৃদুলকে চুপ করে থাকতে দেখে পদ্মজা বললো,'বলুন ছোট ভাই।' মৃদুল বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ছাড়ল। তারপর বললো,'কোনো নাম নাই। আমি পূর্ণারে পছন্দ করি। আর পূর্ণা আমারে।'

পদ্মজার বুক থেকে ভারি বোঝাটা নেমে যায়। মৃদুল এক প্রশ্নে সত্য কথা বলতে পেরেছে ভেবে আনন্দ হচ্ছে। কথাবার্তা বাড়ানো সম্ভব নয়। হাতে সময় নেই। তাই সে নড়েচড়ে বসে বললো,' আপনি বা আপনার পরিবার বিয়ের জন্য প্রস্তুত আছেন? পূর্ণাকে বিয়ে করতে চান?'

মৃদুল আবারো আমির-পদ্মজাকে দেখলো। আমির তার দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে। সে নীরব দর্শক। মৃদুল বুঝতে পারছে

না,কীভাবে জবাব দিলে ভদ্র দেখাবে। প্রেমিকার অভিভাবকের সাথে কথা বলার জন্য আলাদা কলিজা লাগে! মৃদুল এক হাতে মাথা চুলকাল। পদ্মজার কেন যেন হাসি পায়। কিন্তু চোখেমুখে গাম্ভীর্য ধরে রাখে। এই মুহূর্তে সে পাত্রীর অভিভাবক! মৃদুল ধীরেসুস্থে বললো,'আম্মা,আব্বা অনেকদিন ধরেই বিয়ের কথা বলতাছে। আমি রাজি ছিলাম না। এখন রাজি আছি।'

পদ্মজা মৃদুলকে আগাগোড়া পরখ করে নিয়ে বললো,'বিয়ের ক্ষেত্রে গায়ের রঙ নিয়ে আপনার মতামত কী?'

প্রশ্ন শুনে মৃদুল থতমত খেয়ে গেল। মনে হচ্ছে,সে পরীক্ষা দিতে এসেছে। মেট্রিক পরীক্ষায় যা পারেনি, লিখেনি। চুপচাপ বসে সময় গুণেছে কখন ছুটি হবে। কিন্তু এখন তো জিততেই হবে। জীবন মরণের প্রশ্ন! সকালে যে

কার মুখ দেখে উঠেছিল! মৃদুল মুখখানা একটুখানি করে বললো,' জানি না ভাবি। আমার চোখে আগে কালা-সাদার ভেদাভেদ ছিল। কিন্তু এখন নাই। কেন নাই,জানি না। হুট করেই মনে হইতাছে,চামড়ায় যায় আসে না। মনের টানটা আসল। যারে ভালোবাসা যায় তার সবকিছুই ভালোবাসা যায়। সব কিছুর উপরে ভালোবাসা। ভালোবাসার সামনে সবকিছু তুচ্ছ।'

মৃদুলের কথা শুনে পদ্মজার বুকটা কেমন করে উঠে। সে আড়চোখে আমিরের দিকে তাকালো। আমিরও আড়চোখে তাকায়। দুজনের চোখাচোখি হতেই আমির উঠে চলে যায়। মৃদুল ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। বললো,'ভাবি ভুল কিছু কইছি? ভাই রাগ কইরা চলে গেল?'

পদ্মজা লুকানো যন্ত্রণা হজম করে নিয়ে বললো,'ভালো কথা বলেছেন। আমি কথা

বাড়াব না। পূর্ণাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলে,দ্রুত নিজের বাড়ি ফিরে যান। অভিভাবক নিয়ে আসুন। আমি আমার বোনকে বিয়ে দেব। আপনার পরিবার রাজি থাকলে আমার আপত্তি নেই। আমার বোন আমার দায়িত্বে। আমি চাই না সে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে দীর্ঘদিন থাকুক। আশা করি দ্রুত সবকিছু হবে।'

মৃদুল খুব অবাক হয়। সে ভেবেছিল,পদ্মজা রাজি হবে না। তাকে রাজি করাতে অনেক কাঠখড় পুড়াতে হবে। কিন্তু পদ্মজা তো রাজি। মৃদুলের
নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হতে থাকে। সকালে কোন সৌভাগ্যবানের মুখ দেখে উঠেছিল মনে করতে পারলে, সে তাকে একটা খাসি দিবে বলে ভাবে। মৃদুল চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পদ্মজাকে সালাম করতে ঝুঁকলো। পদ্মজা আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায়।

সে দ্রুত বিছানার উপর পা তুলে ফেললো। আর বললো,’আসতাগফিরুল্লাহ! ছোট ভাই আপনি আমার বড়।’
মৃদুল আনন্দে আত্মহারা। তার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা কাজ করছে। কী করবে না করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এতো দ্রুত হুট করে এমন সুন্দর প্রস্তাব পাবে,সে ভাবেনি। ঠোঁটে হাসি রেখে বললো,’আমি শনিবারেই বাড়িত যামু। রবিবারেই আম্মা,আব্বারে নিয়া আসব। আপনি চিন্তা কইরেন না।’
মৃদুলের নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। সে ভীষণ উত্তেজিত বোঝাই যাচ্ছে। পদ্মজা পানি খেতে বললো। মৃদুল পানি পান করে। তারপর বললো,’আসি ভাবি?’
‘যান। আল্লাহ আপনার ভালো করুক।’

মৃদুল তাড়াহুড়ো পায়ে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হাসে। মৃদুল একদম পূর্ণার মতো। ছটফটে,

চঞ্চল। আমির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। পদ্মজাকে হাসতে দেখে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। ধীর পায়ে জায়গা ত্যাগ করে বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়ায়। দূর আকাশে চোখ রেখে কী যেন ভাবে। তখন রিদওয়ান আসে। আমিরকে জানায়,'শুক্রবারে সমাবেশ হচ্ছে না।'
আমির প্রশ্ন করলো,'কেন?'
'শীতের কাপড় এখনো আসেনি। কালদিন পরই শুক্রবার।'
'আব্বার কাজই এমন। ভাগ্য ভালো গ্রামবাসীকে আগে দাওয়াত দেয়া হয়নি। শুধু চেয়ারম্যানদের দেয়া হয়েছিল। সমাবেশ যে হচ্ছে না তাদের জানানো হয়েছে ?'
'হয়েছে। তুই কি আমার সাথে বের হবি?'
'আমি অন্যদিকে যাব।'
'রাতের ঘটনা শুনলাম। আরভিদের লাশটা কী করা হয়েছে?'

‘যা করা হয় তাই করা হয়েছে। বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য সম্ভব হয়নি।’
‘আমি ঘুমে না থাকলে এমন কিছুই হতো না।’
আমিরের মেজাজ বিগড়ে যায়। বললো,’তো ঘুমালি কেন?’
‘তুই বউয়ের প্রতি দরদ দেখিয়ে আমাদের দলের একজন বিশ্বস্ত,শক্তিশালীকে হারালি।’
আমির কিছু বললো না। রিদওয়ান বললো,’পদ্মজার বুকেও ডরভয় নাই। সব তোর দোষ!’
আমির ক্রোধ নিয়ে বললো,”আমার সাথে গলা উঁচিয়ে কথা বলবি না।’
‘কী করবি? মারবি? মার।’
আমির দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কিড়মিড় করে বললো,’রিদওয়ান! মুখ নিয়ন্ত্রণ কর। নয়তো বিছানায় না, সোজা কবরে যাবি। পুরনো

প্রতিশোধ
নিয়ে নেব।'
রিদওয়ান আমিরের দিকে অগ্নি দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়। আমির গ্রিল খামচে ধরে। তার কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। রেগে গেলেই তার কপাল ঘামে!

ফরিনার ঘর অন্ধকারে ডুবে আছে। মজিদ হাওলাদার আলাদা থাকেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে আগে হারিকেন জ্বালাল। বিছানার এক কোণে রেখে ফরিনার পাশে বসলো। ফরিনা ঘুমাচ্ছেন। নিশ্বাস নিচ্ছেন ঘন ঘন। দেখে মনে হচ্ছে,কেউ রূহর গলা চেপে ধরে রেখেছে। ফরিনা নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য ছটফট করছেন। পদ্মজার বুকটা ব্যথায় ভরে উঠে। সে ফরিনার চুলে বিলি কেটে দেয়। আরেক হাতে ফরিনার এক হাত শক্ত করে ধরে। হাত দুটো নিস্তেজ,নরম! যেন মরে গেছে। পদ্মজার কষ্ট

হয়। মনে পড়ে প্রথম হাওলাদার বাড়িতে প্রবেশ করার কথা। কত মানুষ ছিল। লাবণ্য বিলেত পড়তে চলে গেল। শুনেছে,লাবণ্য বিলেতের এক ছেলেকে বিয়ে করতে চলেছে। আমির অনুমতি দিয়েছে। ফরিনা কষ্ট পেয়েছেন। রানি আপা কোথাও চলে গেল কে জানে! কষ্টের পরিমাণ কতোটা বেশি হলে একটা মানুষ এভাবে হারিয়ে যায়? মদনকে আজ সারাদিন দেখা যায়নি। কোথায় সে? ফরিনা চোখ খুললেন। পদ্মজাকে দেখে মৃদু হাসলেন। পদ্মজা বললো,’কেমন আছেন আম্মা? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?’

ফরিনা পদ্মজার এক হাত ধরে বললো,’তুমি আইছো মা।’

‘আসছি আম্মা। কিছু লাগবে?’

ফরিনার কথা বলতে খুব কষ্ট হয়। সারা শরীরে আগুন পুড়ানো জ্বালাপোড়া। ঘরটাকে মৃত্যুপুরী মনে হয়। পৃথিবী তাকে আর রাখতে

চাইছে না। ঠেলে যেন সরিয়ে দিচ্ছে অজানা জগতে। তিনি সময় নিয়ে বললেন,'কিছু লাগব না মা। তুমি আমার ধারে থাহো।'

পদ্মজা ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,'আছি আম্মা। আছি আমি।'

ফরিনা হারিকেনের নিভু আলোয় পুরো ঘরটাকে দেখলেন। পদ্মজাকে দেখলেন। আচমকা ডান পা বিরতিহীন কাঁপতে থাকে। তিনি পদ্মজার শাড়ি খামচে ধরে ভয়ার্ত স্বরে বললেন,'আমারে নিয়া যাইতাছে। আমারে ধরো পদ্মজা। আমারে ধরো। আমারে নিয়া যাইতাছে। যা,যা এখান থেকে যা।'

তিনি কাঁদতে থাকেন। পদ্মজা ভয় পেয়ে যায়। এক হাতে ফরিনার ডান পা চেপে ধরে। ধীরে ধীরে কাঁপাকাঁপি থেমে যায়। পদ্মজা দ্রুত ফরিনাকে পানি পান করালো। তারপর বললো,'কিছু হয়নি আম্মা। কেউ নেই এখানে। আপনি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন।'

ফরিনা ভীত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,’কেউ নাই!’

‘না নেই। ঘুমানোর চেষ্টা করুন আম্মা।’

ফরিনা পদ্মজার দুই হাত আঁকড়ে ধরে চোখ বুজেন। পদ্মজা ছাড়া মানুষটার কেউ নেই। তিনি পদ্মজাকে কতোটা বিশ্বাস করেন,ভরসা করেন সেটা হাত ধরে রাখা দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

বসে থাকতে থাকতে পদ্মজার চোখ দুটি লেগে আসে। তখন ফরিনা চোখ খুলে বললেন,’আমার আম্মার নাম ফুলবানু আছিল। রামপুরার ছেড়ি।’

পদ্মজার ঘুম ছেড়ে যায়। সে নড়েচড়ে বসে। আরো একটি জীবনের গোপন অধ্যায়ের স্বাক্ষী হতে চলেছে পদ্মজা। ফরিনার চোখের দৃষ্টি ছাদে। তারা দুজন ছাড়া কোথাও কেউ নেই। বাইরে থেকে শেয়ালের হাঁক ভেসে আসছে। ফুলবানু দেখতে সুন্দর ছিল বলে তার নাম

ফুলবানু হয়। ফুলবানুর মা মারা যায়,যখন ফুলবানুর বয়স ছয়। বাবার আদরেই বড় হয়। যখন ফুলবানুর চৌদ্দ বছর বয়স তখন বনেদি এক পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। তাদের যৌতুকের চাহিদা অনেক। তাও ফুলবানুর বাবা রাজি ছিলেন। জমিজমা,গরু-ছাগল বেঁচে মেয়ের বিয়ে দিলেন। একটাই যে মেয়ে ছিল। মেয়ের সুখই সব। ফুলবানুর সংসার দুই মাসের বেশি ভালো যায়নি। স্বামী চাপ দেয়,যৌতুকের জন্য। ফুলবানু সে খবর তার বাবার কাছে পাঠায়। ফুলবানুর বাবা শেষ সম্বল বাড়িটিও বিক্রি করে দেন। মেয়েকে সুখী করে নিজে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বেছে নেন অনিশ্চিত জীবন। মানুষটার খবর আর পায়নি ফুলবানু। বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে সে জানে না। বিয়ের বছর খানেকের মাথায় জন্ম হয় ফরিনার। ফুলবানুর শ্বশুরবাড়ি অপেক্ষায় ছিল,ছেলের আশায়। মেয়ে দেখে তারা কপাল

কুঁচকায়। এদিকে ফুলবানুর স্বামীর সম্পর্ক হয়েছে আরেক বনেদি ঘরের মেয়ের সাথে। যার বয়স ফুলবানুর স্বামীর চেয়েও বেশি। মেয়ে জন্ম দেয়ার অপরাধে ফুলবানুকে সহ ফরিনাকে রাস্তায় ফেলে দেয় তারা। ফুলবানুর স্বামী বিয়ে করে বনেদি ঘরের সেই মেয়েকে। যৌতুক দিয়ে ভরিয়ে দেয় ঘর! সেখানে এতিম ফুলবানুর জায়গা হয়নি কিছুতেই। রাস্তায় কত অমানুষ ছিঁড়ে খায় তাকে। তবুও রক্তাক্ত অবস্থায় ফুলবানু ধরে রাখে তার আদরের একমাত্র কন্যা ফরিনাকে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অলন্দপুরের বাজার বেছে নেয় ফুলবানু। এক পাগলির মেয়ে হিসেবে বড় হতে থাকে ফরিনা। বয়স বাড়তে বাড়তে বারোতে এসে ঠেকে। সেই সময়ে এক চন্দ্রহীন রাতে মজিদের শিকার হয় ফরিনা।

চলবে...